রামকৃষ্ণ





ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স

তিন-আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ৬

বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বাহাদুর কর্ত্তৃক
লাইব্রেরী ও প্রাইজের জন্য নির্দ্দিষ্ট।
(কলিকাতা গেজেট, ১৩ই আগষ্ট, ১৯১৯)

ঠাকুর রামকৃষ্ণ

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, সম্রাট্ পঞ্চমজর্জ্জ প্রভৃতি রচয়িতা
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

চতুর্থ সংস্কর

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩৩২

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা

৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্ এর পুস্তকালয় হইতে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

১০৮ নং নারিকেলডাঙ্গা মেন্ রোড, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



ঠাকুর রামকৃষ্ণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ধার্ম্মিক দম্পতি

বিজন বনে, গাছের ডালে সৌরভময় ফুলটি ফুটিয়া থাকার চেয়ে, দেবতার চরণে অঞ্জলি দিলে তাহার যেমন সৌন্দর্য্য ও সমাদর বৃদ্ধি পায়, তেমনি যাঁহারা মহৎ—যাঁহারা উচ্চ, যাঁহারা পূজনীয়—তাঁহারা যদি সংসারে সর্ব্বসাধারণ মনুষ্য জাতির উপকার ও উন্নতির জন্য বন্ধুর মত চেষ্টা করেন, তাহাতে তাঁহাদের গৌরব এবং সম্মান শত গুণ বাড়িয়া থাকে।

যিনি যত বড়—যত মহৎ—যত উচুদরের লোক হউক না কেন তিনি যদি দরিদ্রের দুঃখে দুঃখিত না হন, তিনি যদি আর্ত্তের চক্ষের জল মুছাইবার চেষ্টা না করেন, তিনি যদি নিজের অপেক্ষা হীন ভাবিয়া—সংসারের অন্য সকলকে ঘৃণা করেন, তবে তিনি মনুষ্য নামের যোগ্য নহেন। তাঁহার সম্মান মিথ্যা, গৌরব মিথ্যা, নাম, যশ, খ্যাতি, অর্থ, সম্পদ সমস্তই বৃথা নষ্ট হইয়া যায়।

সেই জন্যই পরদুঃখকাতর—পরহিতৈষী, স্বার্থত্যাগী ব্যক্তিগণ এ সংসারে মহাপুরুষ বলিয়া দেবতার ন্যায় সম্মান, গৌরব, সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। লোকে চক্ষে দেবতা দেখিতে পায় না, তাঁহাদিগকেই দেবতা জ্ঞানে ভক্তি, সম্মান ও পূজা করিয়া ধন্য হয়।

বর্দ্ধমানের চৌদ্দ-পনের ক্রোশ দক্ষিণে ও জাহানাবাদের পাঁচ ছয় ক্রোশ পশ্চিমে 'দেরে'গ্রাম। গ্রামখানি ক্ষুদ্র হইলেও—পরিষ্কার

ছিল—ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ছবিখানির মত সুন্দর। সে গ্রামে কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকেরও বসবাস ছিল। তাহার মধ্যে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়কে ধার্ম্মিক গৃহস্থ বলিয়া সকলেই সম্মান করিত।

বেলা দুই প্রহর অতীত হইয়াছে, সূর্য্যদেব আকাশের মাঝখানে উঠিয়া আগুনের মত তপ্তকিরণে পৃথিবী দগ্ধ করিতেছেন। গ্রামের অধিকাংশ লোকই মধ্যাহ্নের আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময়ে দূর গ্রাম হইতে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হইলেন।

সহর জায়গায় যাঁহাদের বাস, তাঁহাদের বাড়ীতে যখনই লোক-জন আসুক না কেন, তাঁহাদের কষ্টে পড়িতে বা ভাবিতে হয় না। কিন্তু 'দেরে'গ্রাম সামান্য পল্লীগ্রাম, দোকান-পাট থাকা দূরের কথা—সপ্তাহে একদিন ছাড়া দুইদিন হাট পর্য্যন্ত বসে না। গ্রামবাসীদের—যাহার যা আবশ্যক—হাটবারে একেবারে এক সপ্তাহের মত কিনিয়া রাখে। সুতরাং সেখানে অসময়ে যদি কেহ গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে সকলকেই একটু চিন্তিত হইয়া পড়িতে হয়।

সেই কারণে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁহার গৃহিণী চন্দ্রমণি ঠাকুরাণী—গ্রামবাসী অন্যান্য লোকের মত দুপুর বেলাতেই খাওয়া দাওয়া সারিয়া লইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না।

তাঁহারা পরম ধার্ম্মিক, হিন্দু ব্রাহ্মণের গৃহে যা কিছু আচার আচরণ, ব্রত-নিয়ম, পূজা-পার্ব্বণ পালন করা কর্ত্তব্য তা পূর্ণমাত্রায় করিয়া থাকেন। গৃহে অতিথি আসিলে দেবতার মত সম্মান ও আদরে তাহার অভ্যর্থনা করিয়া সেবা ও পরিচর্য্যায় তুষ্ট করতঃ তবে আপনারা জলগ্রহণ করেন। দ্বারে ভিক্ষুক আসিলে—শত কর্ম্ম ফেলিয়া রাখিয়াও—ছুটিয়া আসিয়া ভিক্ষা দিয়া যা'ন। কোন প্রকারে প্রার্থী হইয়া কেহ আসিলে প্রাণ দিয়াও তাহার অভাব পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন।

ইহা ছাড়াও, পাড়াপ্রতিবাসীর রোগে শোকে দিবারাত্রি বিচার না করিয়া, গিয়া সেবা শুশ্রূষা করেন, লোকের দায়ে-অদায়ে, বিপদে-আপদে আপনারা ছুটিয়া গিয়া বুক দিয়া পড়েন, কোন সুযোগে কাহারও বিন্দুমাত্র উপকার করিতে পারিলে তাঁহারা যেন আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিয়া থাকেন।

তাঁহারা দরিদ্র—ঠাকুর পূজা করিয়া, যজমানের ক্রিয়া-কর্ম্ম করিয়া অতিকষ্টে কোনরূপে দিন যাপন করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পর-সেবার জন্য কাহারও নিকটে কিছুমাত্র প্রত্যাশা করেন না। কেহ কিছু পুরস্কার দিতে আসিলে বা উপকারের প্রতিদান স্বরূপে কোন কিছু দিতে গেলে, অতি বিনীত নম্রভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। এইরূপ স্বভাব দেখিয়া—এমনতর নিস্বার্থ পরসেবাব্রতধারী বলিয়া সমস্ত দেরে গ্রামের এবং পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য গ্রামের সকলেই তাঁহাদিগকে পরম ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি এমন সত্যপ্রিয়, ন্যায়বান্ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ দম্পতি যে, জীবনে কখনো মিথ্যাকথা বলিতে জানেন না, প্রাণ গেলেও, ভ্রমেও কখনো অন্যায় কার্য্য করেন না—অন্যায় কথা বলেন না, এবং সর্ব্বদাই সকলের প্রতি আপনাপন কর্ত্তব্য পূর্ণমাত্রায় সম্পাদন করিতে চেষ্টা করেন। এই সব কারণে তাঁহাদের প্রতি লোকের এরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা যে, বড় মানুষেরা টাকা দিয়াও যে কার্য্য করাইতে পারেন না —তাঁহাদের মুখের কথাতেই সে কাজ দেখিতে দেখিতে হইয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন লোকের বিবাদ-বিসম্বাদ তাঁহাদের কথায় মিটিয়া যায়, গ্রামের দলাদলি তাঁহাদের মধ্যস্থতায় ভাঙ্গিয়া যায়, তাঁহারা সালিশি করিয়া বিচার করিয়া দিলে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া সেই বিচার মানিয়া লয়—কেহ আর নালিশ করিবার জন্য আদালতে কিম্বা জমীদার বাড়ীতে ছুটিয়া যায় না।

সুতরাং দরিদ্র হইলেও সে গ্রামে চট্টোপাধ্যায় দম্পতির যত্ন, সমাদর ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির অভাব ছিল না—পরম ধার্ম্মিক বলিয়া সকলেই তাঁহাদের ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

সেদিন, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া থাকিয়াও, যখন আর কোন অতিথি আসিবার সম্ভাবনা রহিল না, তখন ক্ষুদিরাম আহারে বসিতে গেলেন। চন্দ্রমণি স্বামীর ভাত বাড়িয়া দিয়াছেন, ক্ষুদিরাম খাইতে বসিবেন এমন সময়ে দ্বারদেশে কে বলিল—"বাড়ীতে কে আছেন? অতিথি এসেছে গো!"

আর খাওয়া হইল না, বাড়াভাত পড়িয়া রহিল, ক্ষুদিরাম শশব্যস্তে উঠিয়া গিয়া অতিথিকে আদর করিয়া ডাকিয়া আনিয়া বসাইলেন।

তারপর স্বামী স্ত্রী দুইজনে মিলিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্ত হইলেন। সে বাড়ীতে অতিথি যে প্রকার আদর যত্ন পাইলেন, সেরূপ বড়মানুষের বাড়ীতেও কখনো পায় নাই, সুতরাং তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন।

অতিথি-সেবার পরে স্বামীকে খাওয়াইয়া চন্দ্রমণি যখন আপনি আহারে বসিতে গেলেন, তখন তাঁহার হাঁড়ি প্রায় শূন্য হইয়া গিয়াছিল। তিনি তাহা দেখিয়া বিন্দুমাত্রও দুঃখিত হইলেন না।—যা কিছু অবশিষ্ট পড়িয়াছিল, তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে আহার করিলেন। আজ যে অসময়ে অতিথির সৎকার করিতে পারিয়াছেন—সেই আনন্দেই আটখানা হইয়া জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

বিকালে বিদায়ের সময়ে অতিথি বলিয়া গেলেন—"চাটুয্যে মশাই! আপনি দরিদ্র বটে, কিন্তু আপনার গৃহে যেরূপ ধর্ম্মাচরণ দেখিলাম সেরূপ আর কোথাও দেখি নাই, জগদীশ্বর শীঘ্রই আপনার পুণ্যের পুরস্কার দিবেন। আপনার গৃহ এক মহাপুরুষের আবির্ভাবে পুণ্যময় ও

ধন্য হইবে—দেবতার ন্যায় আপনার বংশ চিরকাল পৃথিবীর লোকের শ্রদ্ধা, সম্মান ও পূজা পাইবে। এ ব্রাহ্মণের কথা মিথ্যা হইবে না।"

"ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ বিফল হইবে না। সে যা' হৌক এই সামান্য দরিদ্রের গৃহে যে ক্ষুদ-কুঁড়া সেবা করিয়া আপনি তৃপ্ত হইয়াছেন—তাহাই আমার পরম পুরস্কার।" বলিয়া ক্ষুদিরাম বিনীতভাবে নমস্কার করিয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন।

ভিতরে আসিয়া চন্দ্রমণিকে কহিলেন—"আজ নারায়ণ বড় রক্ষা করিয়াছেন। ভাগ্যে আমি আহার করি নাই, তাহা হইলে সে দুঃখ আর রাখিবার জায়গা থাকিত না। আজ তো ঘরে তেমন কিছুই ছিল না, তবুও ব্রাহ্মণ আপন মহত্ত্ব-গুণে পরিতৃপ্ত হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গিয়াছেন।"

শুনিয়া আনন্দে চন্দ্রমণির চক্ষে জল আসিল, কহিলেন—"প্রভু! তুমি স্বামী, দেবতা, আমার নারায়ণ—তোমার আশীর্ব্বাদেই তোমার কার্য্য করিতে পারিয়াছি। ব্রাহ্মণ যে সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন—ইহাতেই ধন্য হইলাম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামত্যাগ

এ সংসার মহা-পরীক্ষার স্থল। জগতে সকলেই আপনাপন কার্য্য অনুযায়ী স্বভাবের পরীক্ষা দিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, কেহই এ পরীক্ষার হাত এড়াইয়া যাইতে পারে না।

বিশেষতঃ ধার্ম্মিক পুণ্যবান লোকের তো পরীক্ষা পদে পদে। সোণাকে পুড়াইলে যেমন তাহার ময়লা নষ্ট হইয়া যায়, বিশুদ্ধ হইয়া

উজ্জ্বল বর্ণ ধারণ করে, ভগবানও তেমনি সৎ লোককে পরীক্ষার অনলে দগ্ধ করিয়া তাহার মলিনতা-টুকু নষ্ট করিয়া তাঁহাকে উজ্জ্বল, গৌরবময়, আদরের বস্তু করিয়া তুলেন।

সংসারে পুণ্য অপেক্ষা পাপের প্রলোভন অধিক, বিবেক অপেক্ষা রিপুর শক্তি প্রবল ; তাই সামান্য কারণে অতি সহজেই মানবের পা পদে পদে পিছ্‌লাইয়া নীচের দিকে নামিয়া যায় এবং একবার নামিতে আরম্ভ করিলে আর সহজে সামলাইয়া উঠিবার উপায় থাকে না। সেই কারণেই দয়াময় জগদীশ্বর বিবেকের দ্বারা পদে পদে তাহাকে সাবধান করিয়া দেন।

কিন্তু মাকাল ফল যেমন দেখিতে পরম সুন্দর, অত্যন্ত লোভনীয়—কিন্তু ভিতরটা অতি জঘন্য, কদর্য্য—তেমনি ভিতরে অতি ঘৃণার ব্যাপার থাকিলেও পাপের উপরটা অত্যন্ত উজ্জ্বল—চাকচিক্যময় বলিয়া মানুষ তাহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া লোভে পড়িয়া যায় এবং ভিতরে কি আছে—না আছে, না জানিয়াই কেবলমাত্র উপরের শোভায় ভুলিয়া তাহার দাস হইয়া পড়ে এবং দিনে দিনে রসাতলে যায়,—দিবারাত্রি বিবেকের সহস্র তিরস্কার খাইয়াও সে প্রলোভনের হাত এড়াইতে পারে না। কিন্তু যিনি সচ্চরিত্র, ধার্ম্মিক, সাধু তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিবেকের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারেন না। সুতরাং সহস্র প্রকারের পাপ-প্রলোভনেও তিনি আত্মবিস্মৃত হন না।

সেই কারণেই ভগবান ধার্ম্মিক লোককেই পদে পদে পাপের প্রলোভনে নিক্ষেপ করিয়া দেখেন যে, তাহাতে সে বিচলিত হয় কি না। তাই এ সংসারে পাপী, অধার্ম্মিক ব্যক্তির অপেক্ষা ধার্ম্মিককে পদে পদে নানা বিপদ—নানা প্রলোভনে পড়িয়া আপন মনের বল ও কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম-নিষ্ঠার পরীক্ষা দিতে হয়। যিনি সংসারের এই সকল ভীষণ পরীক্ষায় বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন, দয়াময়

জগদীশ্বর পরিণামে তাঁহাকে অমূল্য বস্তু পুরস্কার দিয়া তাঁহার সম্মান ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।

পরম ধার্ম্মিক—নিষ্ঠাবান্—সাধু-চরিত্র ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়েরও এক মহা পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইল।

'দেরে' গ্রামের জমিদারের সহিত অন্য এক ব্যক্তির বিষয়-সম্পত্তি লইয়া একটা ভয়ানক মোকদ্দমা বাধিল। উভয় পক্ষেরই জলের মত অর্থব্যয় হইতে লাগিল। প্রত্যেক পক্ষই বিপক্ষকে হারাইয়া মোকদ্দমা জিতিবার জন্য যত প্রকারের তদ্বির করা আবশ্যক, করিতে লাগিল। দুই পক্ষেরই এমন জিদ্ চাপিয়া গেল যে, যেমন করিয়া হউক—ছলে বলে, কলে-কৌশলে, অর্থে-সামর্থ্যে—যে কোন প্রকারে বিপক্ষকে হারাইতে হইবে। সুতরাং দুই পক্ষেই উদ্যোগ আয়োজনের ধূম পড়িয়া গেল।

অনেকদিন ধরিয়া মোকদ্দমা চলিতে লাগিল, কোনরূপ মীমাংসা হইল না। কোন্ পক্ষ যে হারিবে আর কোন্ পক্ষ যে জিতিবে তাহার নিশ্চয়তা রহিল না। তখন জমিদার পক্ষীয় উকীল-ব্যারিষ্টার প্রভৃতি পরামর্শ দিলেন যে—"গ্রামের মধ্যে ধার্ম্মিক, ন্যায়পরায়ণ, সত্যবাদী বলিয়া যাঁহার খ্যাতি আছে, সেই ব্যক্তিকে আনিয়া যদি এই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারেন এবং যদি তিনি আপনার দিকে টানিয়া বলেন, তবেই এ মোকদ্দমায় আমরা নিশ্চয় জিততে পারি, নচেৎ হারিবার সম্ভাবনা অধিক।"

তখন জমিদার গ্রামের ভিতরে সেই প্রকার ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সকলেই একবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন যে "ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত যথার্থ ধার্ম্মিক, সাধু, সচ্চরিত্র, ন্যায়বান এবং সত্যবাদী পুরুষ—এ গ্রামে কেন, এ জেলার ভিতরে আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। তিনি যদি আপনাদের হইয়া

সাক্ষ্য দিয়া আসেন, তাহা হইলে আপনি নিশ্চয়ই মোকদ্দমায় জয়লাভ করিবেন।"

শুনিয়া জমিদার বাবু আশায় নাচিয়া উঠিলেন,—ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় অতি দরিদ্র, মাসের মধ্যে ত্রিশ দিন দুইবেলা অন্ন জুটে কি না সন্দেহ, সুতরাং তাঁহাকে হাত করিতে যে বিলম্ব হইবে না তাহা তিনি মনে মনে স্থির করিয়াই রাখিলেন। কিন্তু গ্রামের সকলেই পরস্পর বলাবলি করিল যে—"ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় না খাইতে পাইলে ভিক্ষা করিবেন—অনাহারে মরিবেন, তবু সে অর্থলোভে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া আসিবেন, ইহা সম্ভব নয়।"

দুই একজন লোক যে জমিদার বাবুকেও ওরূপ কথা না বলিল এমন নয়, কিন্তু তিনি সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন, কহিলেন—"ওহে, জান না, অন্ন-চিন্তা বড় ভয়ঙ্কর বস্তু। যাহার খাইবার পরিবার ভাবনা নাই সে ব্যক্তি অনায়াসেই সাধুগিরি দেখাইতে পারে, অর্থের লোভ সামলাইতে পারে, মিথ্যা কথা না বলিতে পারে, কিন্তু যাহার ঘরে নিত্য হাহাকার—দুইবেলা উনান জ্বলে না, সে টাকা পাইলে অনায়াসেই হাসিতে হাসিতে সকলপ্রকার কার্য্যই করিতে পারে। বিশেষ, সে যখন আমার প্রজা—তখন যে আমার হইয়া তাহাকে সাক্ষ্য দেওয়াইতে পারিব, তাহাতে সন্দেহ নাই। কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া কেহই জলে বাস করিতে পারে না, সাক্ষ্য না দিয়া ক্ষুদিরাম যাইবে কোথায়?"

জমিদার বাবু ক্ষুদিরামকে ডাকাইয়া তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্য দিবার জন্য বলিলেন। ক্ষুদিরাম দেখিলেন যে, মহা বিপদ উপস্থিত। তিনি জমিদারের প্রজা, সাক্ষ্য না দিয়া তাঁহার পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, জমিদার বাবু রাগ করিলে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। তিনি দীনদরিদ্র ব্রাহ্মণ, অত বড় জমিদারের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবেন না।

এদিকে সাক্ষ্য দিলে—মিথ্যা কথা বলা হয়, তাহাতে নিরপরাধ বিপক্ষ পক্ষের অত্যন্ত অনিষ্ট হইতে পারে। তিনি জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া একজনের সর্ব্বনাশ করিবেন?

ক্ষুদিরাম ভাবনায় অকূল সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এদিকে জমিদার বাবু তাঁহাকে যেমন পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, তেমনই নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি ক্ষুদিরামের বাকী-খাজানা মাপ করিবেন, উপরন্তু যত টাকা চাহেন—তাহাই দিবেন, তাঁহাকে আরও জায়গা-জমি দিবেন, নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দিবেন, তাঁহার দুঃখ ঘুচাইবেন। ক্ষুদিরামকে আর অন্নবস্ত্রের জন্য হা-হা করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

প্রলোভন অত্যন্ত গুরুতর! বিশেষ ক্ষুদিরামের মত দীন দরিদ্র ব্রাহ্মণের পক্ষে! অন্য কেহ হইলে এত প্রলোভন কখনই ত্যাগ করিতে পারিত না, কিন্তু ক্ষুদিরাম হঠাৎ কিছুই উত্তর দিতে পারিলেন না। ভাবিতে ভাবিতে গৃহে আসিয়া পত্নীকে সকল কথা শুনাইয়া কহিলেন—

"এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য বল দেখি?"

স্ত্রী উত্তর করিলেন—"তুমি স্বামী—দেবতা, তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার উপরে আমি কি কিছু বলিতে পারি? তবে আমার মনে হয় যে ধর্ম্মপথে থাকিয়া একসন্ধ্যা খাওয়া ভাল—ভিক্ষা করা ভাল—না খাইয়া মরাও ভাল, তবু অধর্ম্মের পথে উপার্জ্জন করিয়া লক্ষপতি হওয়াও ভাল নহে।"

ক্ষুদিরাম আনন্দিত হইয়া কহিলেন—"আমিও তাহাই ভাবিয়াছি, কিন্তু এক ভয় যে কুমীরকে রাগাইয়া জলে বাস করা চলে না। আমি যদি জমিদারের পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য না দিই তাহা হইলে আমাদের পদে পদে বিপদ ঘটিবে, এ গ্রামে বাস করা ভার হইবে।"

"তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা কাঙ্গাল—যেখানে যাইব চিরকালই দুঃখ-ধান্দা করিয়া খাইতে হইবে, তাতে আর ভয় কি? তেমন হয়—তবে এ গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যগ্রামে চলিয়া যাইব। যিনি জীব দিয়াছেন—এতদিন আহার দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন, তিনিই আহার দিবেন। তা বলিয়া ভয়ে কি লোভে পড়িয়া অধর্ম্ম পথে যাইতে কিছুতেই মন সরিতেছে না।"

ক্ষুদিরাম উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—"সত্য বলিয়াছ, ভাবনায় আমি অস্থির হইয়াছিলাম; হায়! ক্ষুদ্র মানব আমরা—সকল সময়ে মন দৃঢ় রাখিতে পারি না। যিনি পঞ্চমবর্ষীয় অজ্ঞান শিশু 'ধ্রুবকে গহন-বনে আশ্রয় দিয়াছিলেন, বালক প্রহ্লাদকে ভীষণ বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন—সেই অনাথনাথ দীনের ঠাকুরই আমাদিগকে রক্ষা করিবেন।"

তখন স্বামী স্ত্রী দুইজনে সেইখানে বসিয়া একান্ত ভক্তিভরে করযোড়ে কহিলেন—"হে দীনবন্ধু নারায়ণ, যখন যে অবস্থায় রাখ ক্ষতি নাই, এই করিও প্রভু—এ জীবনে যেন তোমার নাম কখনও না বিস্মৃত হই—অধর্ম্মের পথে কখনও যেন প্রবৃত্তি না যায়।"

ক্ষুদিরামের মন দৃঢ় হইল, তিনি সহস্র প্রলোভন ও বিপদের ভয় অগ্রাহ্য করিলেন—কিছুতেই জমিদার পক্ষ হইয়া সাক্ষ্য দিলেন না। জমিদার বাবু ভয়ঙ্কর রাগিয়া উঠিলেন।

তাহার ফল এই হইল যে ক্ষুদিরাম সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া সপরিবারে গিয়া দেড় ক্রোশ দূরে "কামার পুকুর" গ্রামে বাস করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপূর্ব্ব শিশু

ক্ষুদিরামের দুইটি পুত্র ছিল, প্রথম—রামকুমার ও দ্বিতীয়—রামেশ্বর। 'কামার পুকুর' গ্রামে আসিয়া বাস করিবার পরে আর একটি সন্তান হইবার সম্ভাবনা উপস্থিত হইল।

সেই সময় হইতে তাঁহাদের গৃহের চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার শুভ লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল, ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণির মন আপনা হইতেই—অকারণে যেন আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহাদের দুঃখ কষ্টের দিন যেন অবসান হইয়া আসিল। কেমন এক প্রকার রমণীয় শান্তিতে তাঁহাদের গৃহ-প্রাঙ্গণ যেন ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল।

তাঁহাদের গৃহে ৺রঘুবীর জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল—ক্ষুদিরাম এবং চন্দ্রমণি প্রত্যহ ভক্তিভরে সেই বিগ্রহের পূজা না করিয়া কোন কার্য্য করিতেন না। তাঁহারা তাঁহাকে জাগ্রত ঠাকুর বলিয়াই জানিতেন এবং যখন যে কোন কার্য্য উপস্থিত হইত, দুইজনেই ঠাকুর ঘরে গিয়া ভক্তিভরে প্রাণ খুলিয়া, জানাইয়া, তাঁহার আদেশ পাইয়াছেন ভাবিয়া, তবে সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন।

যখন গৃহের চতুর্দ্দিকে আপনা-আপনি নানা সুলক্ষণ সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল, অভাব দূর হইয়া সংসারে স্বচ্ছলতা আসিতে আরম্ভ হইল, সর্ব্বদাই বিমল শান্তিতে মন পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল তখন রঘুবীর জীউর অনুগ্রহ ভাবিয়া স্বামী স্ত্রী দুইজনেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া উঠিলেন এবং নিয়ত একমনে ভক্তির সহিত বিগ্রহের পূজা ও সেবা করিতে লাগিলেন।

এদিকে যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই চন্দ্রমণির সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দেহে রূপ যেন আর ধরে না—চলিতে

ফিরিতে, উঠিতে বসিতে আলোক-রশ্মির মত সর্ব্বদাই যেন ঠিকরাইয়া পড়ে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ক্ষুদিরাম অবাক হইয়া চাহিয়া থাকেন, ভাবেন—এও দৈব ঘটনা—রঘুবীর জীউর অনুগ্রহ।

চন্দ্রমণির রূপবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনেও ধর্ম্মভাব দিন দিন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে লাগিল। দিন-রাত কেবল ঠাকুর-দেবতার কথা শুনিতে, বলিতে ভালবাসেন, দিন-রাত কেবল পূজা-আর্চ্চা, জপ-তপ, দান-ধ্যান লইয়া থাকেন, দিন-রাত আপনাকে রঘুবীর জীউর ছায়ার মত তাঁহার চরণতলে ফেলিয়া রাখিতে চাহেন।

কিন্তু তিনি দরিদ্রের পত্নী—সংসারে একা, ঝি-চাকর লোক-জন নাই, সহায় সম্পদ নাই, কাজেই স্বামীসেবা, পুত্র-পালন, সংসারধর্ম্ম ছাড়িয়া কেবল দেবতার ঘরেই সর্ব্বদা থাকিতে পারেন না। সংসারের সকল কাজ কর্ম্ম সারিয়া, যখনই সময় পান তখনই গিয়া ঠাকুরের চরণ-তলে বসিয়া ভক্তিভরে ধ্যানে নিমগ্না হন। তখন তাঁহার সেই রূপ জ্যোতি যেন আরও সহস্রগুণে উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তখন তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিলে মনে হয়—বুঝি কোন সংসারত্যাগিনী তপস্বিনী ইষ্ট-দেবতার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

'দেরে'গ্রামে থাকিবার কালে, সেখানে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের যেমন মান-সম্ভ্রম, খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল, 'কামার পুকুরে' আসিবার পর হইতে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। গ্রামের কি ইতর কি ভদ্র—কি ছোট কি বড়—সকলেই তাঁহাদিগকে পরম ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাঁহাদের সাহায্য করিবার জন্য আগ্রহে ছুটাছুটি করে, তাঁহাদের সন্তোষ বিধানের জন্য প্রাণ-পাত করিতে চাহে।

পাড়ার পুরুষেরা যেমন সর্ব্বদাই আসিয়া সংবাদ লয়, দেখা শুনা করে, স্ত্রীলোকেরাও তেমনি সদাসর্ব্বদা আসিয়া বাটীর ভিতরে

চন্দ্রমণির সঙ্গে গল্পগুজব করে এবং তাঁহার মুখে ধর্ম্মের কথা, পুরাণের গল্প, ঠাকুর-দেবতার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া উঠে।

এইরূপে চট্টোপাধ্যায় পরিবার কামারপুকুরের সকলেরই আত্মীয়-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছেন। সুতরাং কতদিনে চন্দ্রমণির আর একটি সন্তান হইবে তাহা দেখিবার জন্য সকলেই আনন্দে ও আগ্রহে দিন গণিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার প্রসবের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

সেদিন বড় শুভ তিথি-নক্ষত্রের যোগ। পাড়ার সকলেই বলাবলি করিতেছিলেন যে—"আজ যদি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্তান ভূমিষ্ঠ হয় তবে সে সন্তান জগতের পূজ্য হইয়া উঠিবেন।" সকলেই ভাবিলেন যে তাঁহাদের যেমন ধর্ম্মের ও পুণ্যের সংসার—তাঁহারা যেমন ধার্ম্মিক ও পুণ্যবান তাহাতে ভগবান নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহ আরও পুণ্যময়—গৌরবময় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবেন।

হইলও তাই; সেইদিন—সেই পরম পুণ্য-তিথি-নক্ষত্রের যোগের সময়ে—মহা পুণ্যক্ষণে ঘর আলো করিয়া চন্দ্রমণির তৃতীয় পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত গ্রামখানির প্রকৃতি যেন মধুময়—শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ফুলে ফুলে সে দিন গ্রামখানি হাসিয়া উঠিল, গন্ধে চারিদিক আমোদিত হইল, পাখীর গানে মুখরিত হইল, মধুর মলয়ের হিল্লোল ছুটিল। রূপ—রস—গন্ধ—গান ও আলোকের তরঙ্গে সমস্ত কামারপুকুর যেন মধুময়—শান্তিপূর্ণ—আনন্দ-নিকেতন হইয়া উঠিল। সকল লোকের মন হইতে সমস্ত দুঃখ-বিপদ ভয়-ভাবনা যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল—সকলের অন্তঃকরণ পবিত্র আনন্দে ভরিয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহার কোন কারণ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, শেষে যখন শুনিল যে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের একটি পুত্র জন্মিয়াছে, তখন সকলেই—সকল কাজ-কর্ম্ম ফেলিয়া ছুটিয়া দেখিতে চলিল।

এদিকে পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রেই যেন কেমন এক প্রকার উজ্জ্বল আলোক-ধারা আকাশ হইতে মুহূর্ত্তের জন্য নামিয়া আসিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহের চাল স্পর্শ করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। যাহারা দেখিল, কহিল "ভগবানের আশীর্ব্বাদ নব শিশুর উপরে বর্ষিত হইতেছে, এ বালক অসাধারণ—বিশ্ব-বিখ্যাত হইবে।"

সঙ্গে সঙ্গে গৃহের অভ্যন্তর প্রদেশও অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া যেন ঝল্‌মল্‌ করিতে লাগিল—সহস্র সহস্র ফোটা ফুলের গন্ধে সৌরভময় হইয়া উঠিল। সমবেত সমস্ত নরনারীগণ আশ্চর্য্য হইয়া বারম্বার এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল—কিন্তু হরি হরি! ঘরে একটির অধিক দুইটি বাতি নাই—ফুলের চিহ্ন মাত্র নাই। সকলেই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

তারপরে সকলে যখন পুত্র দেখিল, তখন আরও অদ্ভুত ব্যাপার! সকলেরই মনে হইল সে সন্তান যেন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্তান নহে, সে সন্তান তাহাদের আপন সন্তান—বুকের ধন—নয়নের মণি—দেহের জীবন। সকলেই যেন সে সন্তানকে চিরকাল বক্ষে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়া আশ মিটে না, বুকে রাখিয়াও সাধ পূরে না, এক মুহূর্ত্ত কাছ-ছাড়া করিয়া রাখিতে গেলে প্রাণ যেন শূন্য হইয়া যায়! সকলেই বিমুগ্ধচিত্তে দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ নয়নে একদৃষ্টে শিশুকে দেখিতে লাগিল।

এ কি আবার? সন্তান হাসিল—মরি মরি সেই খানে যেন, এক সঙ্গে শত চন্দ্রের উদয় হইল! এ কি অপূর্ব্ব ব্যাপার—চাঁদের কিরণ ঘরের ভিতর ঢেউ খেলাইয়া, সকলের সর্ব্বাঙ্গে আলোক মাখাইয়া ঘরময় হাসির রাজত্ব বিস্তার করিয়া দিল। কি সুন্দর—কি মধুর—কি স্নিগ্ধ রমণীয় শোভাময়, অপরূপ দিব্য জ্যোতি দেখিয়া দেখিয়া সকলে বিভোর হইয়া গেল। ক্ষুদিরাম ও চন্দ্রমণি দেবতার বিশেষ অনুগ্রহ ও

আশীর্ব্বাদ ভাবিয়া ভক্তিভরে গৃহস্থিত ৺রঘুবীর বিগ্রহের চরণতলে লুটাইলেন এবং প্রাণ ভরিয়া তাঁহার পূজা করিলেন।

শিশু দিন দিন শুক্লপক্ষের শশীকলার মত বাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার দেহে একে একে নানারূপ আলৌকিক লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। শিশু রোদন কাহাকে বলে জানেন না, যেখানে কান্নার শব্দ তাহার ত্রি-সীমায় থাকিতে পারেন না, যাইতে চাহেন না। আপনি সদানন্দময়—সর্ব্বদাই অধরে মধুর হাসি লাগিয়া আছে; যেখানে আনন্দ —যেখানে হাসি—যেখানে প্রেম-প্রীতি শিশু সেইখানে থাকিতেই ভাল-বাসেন, চারিদিকের সকলকে হাসাইয়া আনন্দ দিয়া নিজে হাসিতে থাকেন। এইরূপে সেই দুধের শিশু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে হাস্ত ও আনন্দের সাম্রাজ্য বিস্তার করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাল্যপ্রকৃতি

শিশুদের স্বভাব যে, তাহারা একটুতেই কাঁদিয়া অস্থির হয়, বায়না লইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তুলে, তাহাদের ভুলাইয়া ঠাণ্ডা করিবার জন্য আত্মীয় স্বজন ব্যস্ত হইয়া উঠে।

কিন্তু ক্ষুদিরামের নব শিশুর সকলই অদ্ভুত। তিনি তো কান্না কাহাকে বলে, তা জানেনই না, সর্ব্বদাই হাসিতে—হাসিতে অমৃত ছড়াইয়া—সকলকে আনন্দময় করিয়া রাখেন, তাহা ছাড়াও, বায়না যে কি বস্তু, কোন দ্রব্য লইবার আকাঙ্ক্ষা যে কেমন তিনি তাহাও জানেন না—শিখেন নাই। এ সংসারে কোন বস্তুতেই যেন তাঁহার প্রলোভন নাই—কামনা নাই।

কেহ কোন দ্রব্য ইচ্ছা করিয়া দিলে তিনি যেমন তাহা আদর করিয়া হাত পাতিয়া লইয়া আনন্দ করেন, কেহ কিছু না দিলেও আনন্দে তাহাকে জড়াইয়া ধরেন। আনন্দই তাঁহার স্বভাব, হাস্য ও প্রীতিই—তাঁহার হৃদয়ের প্রতিদান। এই গুণে পাড়ার লোকেরা সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া দিনে শতবার ছুটিয়া দেখিতে আসে।

সেই সদানন্দময় অপূর্ব্ব শিশুর চাঁদমুখে মধুর হাসি দেখিয়া সকলে বিভোর হইয়া যায়, তাঁহার মধুমাখা আধ-আধ কথা শুনিয়া সকলে দুঃখ শোক ভুলিয়া যায়। তাঁহার কচি মুখখানিতে কি যাদু মাখানো আছে—যে দেখে, সেই আপনা-ভুলিয়া কোলে লইয়া মুখচুম্বন করে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে যেন তাহাদের এ জীবনের সকল দুঃখ দৈন্য জ্বালা ঘুচিয়া জীবন পবিত্র—জন্ম ধন্য হইয়া উঠে। এইরূপে ক্ষুদিরামের শিশু গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নয়নের মণি স্বরূপ হইয়া দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন। পিতামাতা আদর করিয়া নাম রাখিলেন—**গদাধর**!

গদাধরের আর একটা অদ্ভুত প্রকৃতি যে, তিনি ফুল পাইলে যেমন আনন্দে মাতিয়া উঠেন, তেমন—আনন্দ আর কিছুতে পান না। ফোটা ফুলগুলি লইয়া ফুলের হাসির সঙ্গে নিজের হাসি মিশাইয়া আনন্দে মত্ত হইয়া উঠেন। একবার ফুলগুলি লইয়া মাথায় রাখেন, একবার অঞ্জলি পূরিয়া লইয়া চুম্বন করেন, একবার বুকে ধরেন—ফুলের সঙ্গে যেন ফুল হইয়া মিশিয়া যাইতে চাহেন। তখন আর তাঁহার কোন কিছু মনে থাকে না—ফুল লইয়া বিভোর হইয়া থাকেন।

ইহা দেখিয়া পাড়ার সকলেই তাঁহাকে ফুল আনিয়া দেয়, তিনিও এমন আগ্রহে তাহা গ্রহণ করেন যে সকলে ভাবে—তাহারা ধন্য হইল। লোকে আপন আপন ইষ্ট দেবদেবী পূজা করিয়া যে সুখ, যে তৃপ্তি, যে আনন্দ না পায়—গদাধরকে ফুল দিয়া তাহার অপেক্ষা

অধিক আনন্দ লাভ করে, সুতরাং সকলেই প্রত্যহ তাঁহাকে ফুল আনিয়া দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠে।

ক্রমে এমন হইল যে পাড়ার লোকজনেরা গদাধরকে আর পরের সন্তান বলিয়া ভাবিতে পারিল না। তিনি যেন তাহাদের প্রত্যেকেরই বুকের ধন—নয়নের মণি! তাঁহাকে আর একদণ্ড না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে না—দিবসের শত কর্ম্ম, সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও ঘুরিয়া ফিরিয়া—নড়িয়া চড়িয়া—ছুটিয়া আসিয়া দেখিয়া যায়। এইরূপে সেই এক শিশু যেন সহস্র শিশু হইয়া গ্রামের প্রত্যেক লোকের হৃদয়-সিংহাসনে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

গদাধর ফুল পাইলে যেমন মাতিয়া উঠেন, প্রকৃতির প্রত্যেক বস্তুতেই তেমনি যেন কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যান। গাছ-পালা দেখিয়া আনন্দ করেন, মেঘের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া থাকেন, পাখীর ডাক শুনিয়া আনন্দে করতালি দেন, সূর্য্যের রশ্মিতে, চন্দ্রের আলোকে, বৃষ্টির ধারায় মুগ্ধ হইয়া নাচিতে থাকেন। দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া থাকে।

সাধারণ মনুষ্যের প্রকৃতির সঙ্গে গদাধরের প্রকৃতির বিভিন্নতা-টুকু সকলেই বুঝিতে পারে এবং বুঝিতে পারিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া ভাবে—এ বালক কে? ইনি কি কোন দেবতা—শাপ-ভ্রষ্ট হইয়া এ পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? অথবা কোন দেবতা মায়ারূপ ধরিয়া তাহাদের সঙ্গে ছলনা করিয়া ভুলাইতে আসিয়াছেন?

কিন্তু তিনি যে-ই হউন না কেন—কেহই তাঁহাকে পর ভাবিতে পারে না—অগ্রাহ্য করিতে পারে না—ভুলিয়া থাকিতে পারে না। সেই শিশুর যে কি অদ্ভুত শক্তি, কি প্রবল আকর্ষণ—তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবার উপায় নাই। যে একবার তাঁহাকে দেখে, একটিবার তাঁহার একটি কথা শুনে, সে-ই অমনি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার

বশীভূত হইয়া পড়ে। কেহই ইহার কোনরূপ কারণ বুঝিতে পারে না, বুঝিবার চেষ্টাও করে না—তাঁহাকে দেখিয়া, কোলে লইয়া, আদর করিয়া, ফুল দিয়া আপনাদের জন্ম সার্থক করিয়া লয়।

সেই অদ্ভুত বালকের নিকট সংসারের প্রত্যেক বস্তুই যেন পরিচিত, তিনি যেন সমস্তই জানেন, চিনেন, বুঝেন এমনি ভাব তাঁহার মধ্যে আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠে। তাঁহাকে যেন কিছুই বলিবার, চিনাইবার, শিখাইবার প্রয়োজন—নাই—বালক হইয়াও, তিনিই যেন পৃথিবীর মানুষকে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সকল ব্যাপার শিখাইয়া দিতে পারেন।

লোকের মুখে ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিলে বালকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠে, ঠাকুর-দেবতার কথা শুনিলে আর অন্য কিছু মনে থাকে না। পূজা দেখিয়া, আরতি দেখিয়া বালক বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া নাচিতে থাকেন, একবার আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া গিয়া ঠাকুরের প্রতিমূর্ত্তিকে জড়াইয়া ধরিতে যান। ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করিলে আর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতে চাহেন না—আহার-নিদ্রা ভুলিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। তখন তাঁহার মুখে, চক্ষে, সর্ব্বাঙ্গে যেন কেমন একপ্রকার অপূর্ব্ব দিব্যজ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়া ঝল্‌মল্ করিতে থাকে! লোকে ঠাকুর দেখিতে আসিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বালকের দিকেই চাহিয়া থাকে।

শুধু যে বালক গদাধর এই সব লইয়াই থাকেন তাহা নহে। পিতা, মাতা, ভ্রাতাদিগকে তিনি অত্যন্ত মান্য করেন, ভক্তি করেন। তাঁহারা উঠিতে বলিলে উঠেন—বসিতে বলিলে বসেন—যাহা আদেশ করেন, মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া পালন করিবার জন্য ছুটিয়া যান। ক্ষুদ্র বালক হইয়াও তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠেন।

বালক কখনও কোন অন্যায় কার্য্য করেন না, অবাধ্যতা জানেন না,—সর্ব্বদাই স্থির—ধীর—প্রশান্ত—আনন্দময়। সুতরাং কখনও এক মুহূর্ত্তের জন্য কাহারও তাঁহাকে শাসন করিবার প্রয়োজন হয় না। যে যাহা বলে তাহাই করেন, যে যাহা দেয় তাহাতেই সন্তুষ্ট হন, সে যাহা চাহে তাহাকে তাহাই দিয়া পরিতুষ্ট করেন।

বালকের যেন সুখ নাই, দুঃখ নাই, আনন্দ নাই, বিষাদ নাই, অভাব নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, প্রয়োজন, প্রার্থনা নাই—তিনি যেন সংসারের সকল বস্তুর অতীত, সকল বস্তু হইতেই বহুদূরে—অথচ সর্ব্বদাই সকল বস্তুর ভিতরে, সকল বস্তুতেই লিপ্ত—সকল বস্তুতেই জড়িত!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পাঠশালে

পাঁচ বৎসর বয়সে ক্ষুদিরাম গদাধরের হাতে খড়ি দিয়া পাঠশালায় পড়িতে দিলেন।

পাঠশালের পড়ো অনেকগুলি—অধিকাংশই দুষ্ট, অশান্ত। গদাধর যেদিন সর্ব্বপ্রথম পাঠশালে ভর্ত্তি হইতে গেলেন, সেদিন গুরুমহাশয় একজন পড়োর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে শাসন করিতেছিলেন।

ছাত্রকে নাড়ু গোপাল করিয়া বসাইয়া হাতে ও ঘাড়ের উপর দুইখানি বড় বড় ইট দিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া লম্বা লক্‌লকে বেত গাছটা তাহার সাম্‌নে নাচাইতে নাচাইতে ধমক দিয়া কহিলেন—

"সাবধান, যদি একচুল নড়িস্, কি ইট পড়ে যায়, তাহ'লে পিঠের ছাল-চামড়া তুলে ছাড়বো।"

ছাত্র সেইভাবে থাকিয়া নাকিসুরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল— "আর করবো না গুরুমশাই, এবারটা মাপ করুন।"

"কোন কথা শুনতে চাই নি—খবরদার যেন ইট পড়ে না—তা হলেই—।"

গুরুমহাশয়ের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, রামকুমার গদাধরকে সঙ্গে লইয়া ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য গিয়া দাঁড়াইলেন।

গুরুমহাশয় চমকিয়া একবার গদাধরের আপাদমস্তক উত্তমরূপে দেখিয়া লইলেন, তাহার পরে বালকের মুখের পানে একদৃষ্টে অবাক্ হইয়া দেখিতে দেখিতে ভাবিলেন—"তাইতো, এ কি ব্যাপার? ইনি যে সর্ব্বশাস্ত্রে, সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী মহাপুরুষ দেখ্‌ছি—এঁকে আমি কি পড়াব? আমিই এঁর কাছে এখন সারাজীবন ধরে শিখ্‌তে পারি। কে ইনি বালকবেশে আমাকে ছলনা করতে এলেন?" গুরুমহাশয় নির্ব্বাক্ হইয়া পাথরের প্রতিমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

তাঁহার এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া রামকুমার ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—"এমন করে অবাক্ হয়ে কি দেখ্‌ছেন? এটি যে আমার ছোট ভাই গদাধর, একে আপনার পাঠশালে ভর্ত্তি করে নিন্।"

গুরুমহাশয়ের মোহ ভাঙ্গিল, চমকিয়া চাহিয়া অপ্রস্তুত হইলেন, কহিলেন—"এস বাবা এস, বস ওইখানে।" তারপরে তাঁহাকে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। সেদিনকার মত সে পড়োটি নিষ্কৃতি পাইল।

সেদিন হইতে গদাধরকে পড়াইতে গিয়া প্রায় প্রত্যহই গুরু-মহাশয়ের মনে হইতে লাগিল—এ বালক যেন সামান্য নহে, যেন কেমন কেমন। হঠাৎ পড়া বলিয়া দিতে মনের ভিতর যেন কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু অহঙ্কারী গুরুমহাশয় শীঘ্রই সে ভাব দমন করিয়া ফেলিলেন, প্রত্যহ একটু একটু করিয়া সাহস আসিয়া তাহাকে ভুলাইয়া দিল, গদাধরকে তিনি সাধারণ পড়োদের মতই পড়াইতে

লাগিলেন। কিন্তু সকল সময়ে তাঁহার সঙ্গে কিছুতেই ঠিক অন্য ছাত্রদের মত ব্যবহার করিতে পারিলেন না।

গুরুমহাশয়ের স্বভাব কিছু রুক্ষ, সামান্য কারণেই যখন তখন পড়োদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া শাসন করিতেন। কিন্তু গদাধর পাঠ-শালে ভর্ত্তি হইবার পর হইতে তাঁহার স্বভাবে একটু পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল।

গুরুমহাশয় পড়োদের উপরে রাগিয়া মারিবার জন্য যেমন বেত তুলেন, অমনি গদাধরের দিকে চাহিলেই যেন তাঁহার রাগ নিমিষের মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়, হঠাৎ থমকিয়া দাঁড়ান, আর অমনি অজ্ঞাতে তাঁহার হস্ত হইতে বেত গাছটি খসিয়া পড়িয়া যায়। তিনি অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া যান।

এদিকে গদাধরের আগমন অবধি পড়োদের স্বভাবেরও অত্যন্ত পরিবর্ত্তন ঘটিতে লাগিল। ছোট বড় যত ছাত্র ছিল সকলেরই সঙ্গে অতি সত্বরে তাঁহার অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইয়া গেল, আর তাহার ফলে সকলেরই স্বভাব শান্ত, শিষ্ট, ধীর হইতে লাগিল। পূর্ব্বে যে সকল পড়োরা দুষ্টামির জন্য বিখ্যাত ছিল তাহারা ক্রমশঃ সৎস্বভাবের জন্য সুখ্যাতি লাভ করিতে লাগিল। বেত না খাইয়া ও তিরস্কার না পাইয়া যাহাদের একদিনও কাটিত না তাহারা এক্ষণে প্রতিদিনই গুরুমহাশয়ের হাসি মুখের মিষ্টকথা পুরস্কার পাইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল যে গুরুর নিত্য-সহচর বেতগাছটা যে কোথায় পড়িয়া থাকিত তাহার খোঁজ খবর করিবারও তিনি আবশ্যক জ্ঞান করিতেন না।

কেবল তাহাই নহে, ছাত্রদের সঙ্গে গদাধরের এমন ভাব হইল যে কেহই তাঁহাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারে না। পাঠশালের ছুটী হইলে ঘরে যাইবার সময়ে গদাধরকে ছাড়িয়া যাইতে কাহারও মন সরে না, সকলেরই চক্ষু ছল-ছল করিয়া উঠে। পরদিন আবার

কতক্ষণে পাঠশালে আসিয়া তাঁহাকে দেখিবে, তাঁহার সঙ্গলাভ করিবে, সেই ভাবনায় সকলেই ঘরে গিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে।

ইহার ফলে গুরুমহাশয়ের একটা পরম লাভ হইল। পূর্ব্বে তাঁহার বেতের ভয়েই হউক, আর পড়ার ভয়েই হউক অনেকগুলি পড়ো প্রায় কামাই করিত, এক্ষণে তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। কামাই করাতো দূরের কথা, গুরুমহাশয় ছুটী দিতে গেলেও কেহ সহজে ছুটী লইতে চাহে না, কারণ পাঠশালে ছুটী থাকিলে তাহারা গদাধরকে দেখিতে পাইবে না। ক্ষুদ্র বালকের এই আকর্ষণী শক্তি দেখিয়া গুরুমহাশয় বিস্ময়ে অবাক্‌ হইয়া গেলেন।

কিন্তু গদাধর পড়াশুনায় তেমন উন্নতি করিতে পারিলেন না। তাঁহার মন সর্ব্বদাই যেন কি এক ভাবে বিভোর হইয়া থাকে—পড়ায় তেমন মনঃসংযোগ করিতে পারেন না। পুস্তকের ভিতর ঠাকুর-দেবতার কথা পাইলে তাঁহার মুখ-চোখ আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠে—সে সব কথা একেবারে অন্তরে মুদ্রিত হইয়া যায়, কিন্তু বাজে কথার বেলা প্রায়ই তেমন হয় না।

অথচ বালকের কি অদ্ভুত শক্তি! যে কথা গুরুমহাশয় নিজে ভালরকম করিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিতেছেন না তিনি তাহা এমন সরলভাবে সুন্দররূপে আপনি বুঝিয়া পরকে বুঝাইয়া দেন যে, গুরু আশ্চর্য্য হইয়া যান। অনেক সময়ে এমন প্রশ্ন করেন যে, গুরুমহাশয় দিবারাত্রি ভাবিয়াও তাহার উত্তর খুঁজিয়া পান না, এক একটা কথার অর্থবোধ পর্য্যন্ত হয় না—অবাক্‌ হইয়া বালকের মুখের পানে চাহিয়া থাকেন।

ধর্ম্মসংক্রান্ত কথায়, ঠাকুর-দেবতার কথায় এক এক সময়ে বালকের মুখ-চোখের ভাব এমন হয়—এমন একটা অপূর্ব্ব জ্যোতি আপনা হইতে ফুটিয়া উঠে যে, তখন দেখিয়া গুরুমহাশয় কিছুতেই

গদাধরকে সাধারণ বালকের মত ভাবিতে পারেন না। অনেক সময়ে তাঁহার এক একটা কথায় গুরু আপনার সংসারিক চিন্তার মধ্যেও যেন সহজ সরল পথ দেখিতে পাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

এইরূপে কঠোর পাঠশালা—ছাত্রগণের আনন্দময় ক্রীড়াভবনে পরিণত করিয়া বালক গদাধর সেইখানে যেন খেলাচ্ছলেই সামান্য রকম লেখাপড়া শিখিলেন। কিন্তু তাহাতেই যে ফল দর্শিল অন্য বালকেরা অতি উত্তমরূপে উচ্চশিক্ষিত হইয়াও তাহার শতাংশের একাংশ লাভ করিতে পারে না।

গুরু মনে মনে ভাবিলেন—যাহাই শিখুক গদাধরের গুরু-মহাশয় হইয়া আমি ধন্য হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আশ্চর্য্য ঘটনা

তখন গদাধরের বয়স ছয় কি সাত বৎসর। পল্লীগ্রামে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা অনায়াসে নির্ভয়ে এ বাড়ী সে বাড়ী এ পাড়া সে পাড়া যাতায়াত করিয়া থাকে। পথে গাড়ী ঘোড়ার উপদ্রব নাই, বিপদ-আপদের ভয় নাই, হারাইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বাড়ীর লোকজন সে সম্বন্ধে ওজর-আপত্তি করেন না।

গদাধরও শৈশবকাল হইতেই তেমনি এখানে সেখানে যাতায়াত করিতেন—বেড়াইতেন। বয়স বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এবাড়ী-ওবাড়ী ছাড়িয়া এপাড়া-ওপাড়া এবং ক্রমে অল্প দূরবর্ত্তী অন্য গ্রামেও যাইতেন—আসিতেন। অধিকাংশ সময়ে বাপ-দাদা সঙ্গে থাকিতেন, আবার অনেক সময়ে একাকীও যাতায়াত করিতেন। এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া অল্প

বয়সেই তিনি মাঠ পার হইয়া গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে স্বচ্ছন্দে বেড়াইয়া আসিতেন।

বিশেষ শৈশব হইতেই তিনি ভাবুক, নির্জ্জনতাপ্রিয় এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-দর্শনে ইচ্ছুক বলিয়া ঘরের ভিতরে বসিয়া থাকিতে পারিতেন না—প্রায়ই একাকী নির্জ্জন মাঠে বেড়াইতেন। অনেক সময়ে কার্য্যগতিকে এ গ্রাম সে গ্রাম যাইতেন—অনেক সময়ে ইচ্ছা করিয়াও ফাঁকা মাঠে মাঠে বেড়াইতেন।

সে দিন তিনি বাড়ীর কোন কার্য্যের জন্য গ্রামের পরে একটা ফাঁকা মাঠ পার হইয়া অন্য একটা গ্রামে গিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় আবার যখন সেই মাঠের উপর দিয়া পার হইয়া আসিতেছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন—অপূর্ব্ব ঘটনা!

নীল আকাশের মাঝখান যেন হঠাৎ ফাটিয়া গেল, আগ্নেয় পর্ব্বতের বিদীর্ণ মুখ-গহ্বর হইতে যেমন জ্বলন্ত গলিত ধাতু সবেগে নির্গত হয়, সেইরূপ সেই ফাটার ভিতর হইতে এক অপূর্ব্ব দিব্য জ্যোতিঃ-ধারা ফোয়ারার জলের মত সবেগে বাহির হইয়া অগ্নিময়ী নাগিনীর ন্যায় হেলিয়া দুলিয়া লক্ লক্ করিতে করিতে নামিতে লাগিল।

সেই জ্যোতিঃ-ধারার এমন প্রখর অথচ স্নিগ্ধ রশ্মি যে—সেই একটি মাত্র শিখার উজ্জ্বলতায় সমস্ত ব্যোমদেশ আলোকিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যের কিরণ ও চন্দ্রের আলোককে পরাজিত করিয়া তাহার শান্ত প্রভা দিবসের রৌদ্রকেও যেন অধিকতর উজ্জ্বল ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিল, স্বর্গীয় আলোকের অপরূপ রূপ-সৌন্দর্য্যে সমস্ত প্রকৃতির বক্ষ পরম রমণীয়, শোভনীয় হইয়া ছবিখানির মত ঝল্‌মল্ করিতে লাগিল!

গদাধর বিস্ময় ও পুলকে বিভোর—আত্মহারা হইয়া একদৃষ্টে সেই আলোক-শিখার পানে চাহিয়া রহিলেন! শরীরে স্পন্দন নাই—চক্ষে পলক নাই—নিশ্বাস-প্রশ্বাসও বুঝি বহিতেছে না! অথচ

মুখমণ্ডলে পরম আনন্দের ভাব—সর্ব্বাঙ্গে অপরূপ সৌন্দর্য্যের বিকাশ! তিনি আত্মহারা, অজ্ঞান, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া প্রস্তর-পুত্তলিকার মত অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আলোক-শিখা হেলিতে দুলিতে, কাঁপিতে কাঁপিতে, নাচিতে নাচিতে নামিতে লাগিল—গদাধরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। আরও যতই তাহা কাছে আসিতে লাগিল ততই গদাধরের শারীরিক সৌন্দর্য্য—সেই আলোক-ধারায় ধৌত হইয়া আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর, আরও অপরূপ শোভাময় হইয়া উঠিল। ক্রমে সে রূপের প্রভা এরূপ বর্দ্ধিত হইল যে গদাধরকে দেখিলে আর মানুষ বলিয়া মনে হয় না, ঠিক যেন কোন দেব-শিশু স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া উপর দিকে চাহিয়া তাঁহার পূর্ব্ব বাসস্থান স্মরণ করিয়া শেষ বিদায় লইতেছেন!

আলোক-শিখা ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটবর্ত্তী হইয়া গদাধরের মস্তক স্পর্শ করিল। অমনি তিনি সম্পূর্ণরূপে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া ধরা-শায়ী হইলেন। সেই আলোক তখন বিদ্যুতের মত সর্ব্বাঙ্গে হেলিয়া দুলিয়া জড়াইয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তারপরে আবার ধীরে ধীরে উঠিয়া নীল আকাশে বিলীন হইতে চলিল।

তখন সেই প্রান্তরের দূরে দূরে, তফাতে তফাতে আরও জন কতক লোক যাতায়াত করিতেছিল। সকলেই এই অদ্ভুত ব্যাপার চাক্ষুস করিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। গদাধর পড়িয়া গেলে তাহারা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া দেখিল যে বালকের জ্ঞান নাই, ভাবিল তিনি মূর্চ্ছিত হইয়াছেন। আলোক-ধারা তখন আবার নীল আকাশের ক্রোড়ে মিলাইয়া গিয়াছিল।

যত্নে কোলে করিয়া সকলেই তাড়াতাড়ি গদাধরকে গৃহে আনিয়া সকল বৃত্তান্ত আমূল প্রকাশ করিয়া কহিল। সকলেই শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

সেই হইতে অনেক জ্ঞানী ব্যক্তি গদাধরকে কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ ভাবিয়া অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার পর হইতে গদাধর বালক হইয়াও গৃহস্থিত ৺রঘুবীর বিগ্রহের পূজা-আর্চ্চা আপনি করিতে যত্নবান হইলেন। বালকের আগ্রহ দেখিয়া কেহই বাধা দিল না।

গদাধর প্রত্যহ আপন হস্তে বাছিয়া বাছিয়া ফুল তুলিয়া আনিয়া নিজে সমস্ত আয়োজন স্বহস্তে করিয়া লইয়া নিত্য রঘুবীর বিগ্রহের পূজা করেন। পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিভোর তন্ময় হইয়া বসিয়া থাকেন। সেই সময়ে হঠাৎ দেখিলে মনে হয় যে, বিগ্রহ যেন জীবন্ত হইয়া গদাধরের সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন।

বালককর্ত্তৃক গৃহ-বিগ্রহ এইরূপে পূজিত হওয়ার পর হইতে ক্ষুদিরামের গৃহ যেন দেবতার পুণ্য আবাসের মত হইয়া উঠিল। দুঃখ নাই, দৈন্য নাই, অভাব নাই, অভিযোগ নাই, পবিত্র শান্তিতে সে গৃহ পূর্ণ হইয়া রহিল। ইহা দেখিয়া পিতা ও ভ্রাতারা পরম আনন্দিত চিত্তে গদাধরের উপরেই ঠাকুরের সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। গদাধরও সেই ভার পাইয়া পরম আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

গদাধরের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর অতি সুমিষ্ট। যে তাঁহার কথা একবার শুনিত সেই মুগ্ধ হইয়া যাইত, তাহার উপর তিনি এমন সুন্দর গান গাহিতে শিখিলেন যে, সে গান শুনিলে—মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক—বনের পশু পক্ষী পর্য্যন্ত মোহিত হইয়া স্তব্ধ হইয়া শুনিত।

আরও একটা অদ্ভুত শক্তি—বালক শ্রুতিধর বলিলেও হয়। যাহা একবার কানে শুনেন, তাহাই তাঁহার অন্তরে একেবারে চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। তখনকার দিনে গ্রামে যাত্রাগান হইত, গদাধর

তাহা একবার শুনিয়া যখন গানগুলি ঠিক সেই প্রকার সুর লয়ে নিজে গাহিতেন, তখন গ্রামশুদ্ধ লোক চারিদিকে সমবেত হইয়া সেই সঙ্গীতে মগ্ন হইয়া যাইত—তাহাদের আর আহার-নিদ্রার কথা মনে থাকিত না—সকলেই বলাবলি করিত "কি ছার যাত্রাগান, এ গান শুনিলে তাহারা আর কখনও এ গ্রামে আসিয়া গাহিতে সাহস করিবে না।" তাঁহার মধুর স্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার মধুর গান শুনিবার জন্য প্রত্যহ দলে দলে লোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া জুটিতে লাগিল।

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর পার্শ্বেই লাহা বাবুদের বাড়ী—তাঁহারাই ঐ গ্রামের জমিদার। সেখানে বাবুদের একঠি অতিথিশালা ছিল এবং সর্ব্বদাই নানা প্রকারের বিস্তর সাধু-সন্ন্যাসী আসিয়া সেই অতিথিশালায় থাকিতেন। সেই অতিথিশালা-সংলগ্ন একটী ঠাকুরবাড়ীও ছিল—সেখানে প্রায়ই পুরাণপাঠ ও কথকতা প্রভৃতি হইত।

গদাধর সর্ব্বদাই সেই অতিথিশালায় গিয়া সমাগত সাধু সন্ন্যাসীদের সেবা করিতেন এবং তাঁহাদের কাছে ঠাকুর-দেবতার কথা শুনিতেন। যতই সে সকল শুনিতে লাগিলেন ততই আরও শুনিবার ইচ্ছা দিন দিন বলবতী হইতে লাগিল।

পুরাণপাঠ বা কথকতা আরম্ভ হইলে গদাধর সর্ব্বাগ্রে ছুটিয়া গিয়া বসিতেন এবং আগাগোড়া পরম ভক্তিভরে একমনে শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে প্রায়ই ভক্তির উচ্ছ্বাসে তাঁহার দুই চক্ষু হইতে জলধারা গড়াইয়া বক্ষস্থল ভাসাইয়া দিত। বালকের এইরূপ-ভাব দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত। এইরূপে শুনিয়া শুনিয়া গদাধর হিন্দুর শাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবতের সমস্ত কথাই অন্তরে গাঁথিয়া লইলেন।

এইরূপে কাল কাটিতে লাগিল—গদাধর দিন দিন ধর্ম্মপথে

অধিকতর আকৃষ্ট হইয়া অধিকতর ভক্তিভরে সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। ক্রমে বছর দুই কাটিয়া গেল। সেই সময়ে ভগবান তাঁহার মস্তকে প্রথম দুঃখের বজ্রাঘাত করিলেন।

গদাধরের বয়ঃক্রম যখন প্রায় আট বৎসর, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হইল। তাঁহার লালন পালনের ভার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের উপর পড়িল। তাঁহারা দুইজনেই, বিশেষ জ্যেষ্ঠ রামকুমার তখন পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

আরও আট নয় বৎসর সেই গ্রামে রাখিয়া গদাধরের ষোল সতরো বয়ঃক্রম কালে পণ্ডিত রামকুমার ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া সর্ব্বপ্রথম কলিকাতায় আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে

কলিকাতায় আসিয়া গদাধর ভ্রাতার সঙ্গে প্রথমে কিছুদিন নাথেরবাগানে রহিলেন, তারপরে ঝামাপুকুরে আসিয়া গোবিন্দচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে থাকিয়া পূজাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতার অনেক স্থানেই পণ্ডিত রামকুমারের শিষ্য-সেবক ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে পরম ভক্তি শ্রদ্ধা করিত। সুতরাং সেই সকল স্থানে রামকুমারের ন্যায় গদাধরও লোকের শ্রদ্ধা-ভক্তি, সম্মান-সমাদর পাইতে লাগিলেন। বিশেষ গদাধরের স্বভাব-চরিত্র দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আপনা হইতেই আকৃষ্ট হইয়া বশীভূত হইতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পকালের মধ্যেই সহরের অনেকস্থলে অনেক গৃহস্থ ও ধনীর গৃহে গদাধরের নাম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল।

দুই ভাই কলিকাতায় থাকিয়া লোকের বাড়ীর ঠাকুর-পূজা

করেন, ক্রিয়া-কর্ম্ম করান, সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মেই আহূত হইয়া গমন করেন। এইরূপ করিতে করিতে গদাধরের স্বভাব এমন হইয়া পড়িল যে ধর্ম্ম-চর্চ্চা ও ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চ্চনা ভিন্ন সংসারের আর কোন কথাই তাঁহার মনে স্থান পায় না। সর্ব্বদাই উদাসীনের মত থাকিয়া কেবল সেই সকল কর্ম্ম করিয়াই ঘুরিয়া বেড়ান। দেখিয়া শুনিয়া রামকুমার মনে মনে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

গদাধরের সংসারে মন নাই—উপার্জ্জনের চেষ্টা নাই—নিজের ভোগ-বিলাসের স্পৃহা নাই, সর্ব্বদাই কেবল ঠাকুর-দেবতার পূজা আরাধনা সেবা-শুশ্রূষার চেষ্টা, দিবারাত্রি কেবল সেই সব আলোচনা—অষ্টপ্রহর কেবল ধর্ম্ম-চর্চ্চা! বলিলেও গ্রাহ্য নাই—বকিলেও দুঃখ নাই—মারিলেও পরিবর্ত্তন নাই! গদাধর সর্ব্বদাই আপনার ভাবেই বিভোর—তন্ময়—আত্মহারা!

রামকুমারকে তাঁহার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, শিষ্য-সেবকেরা গদাধরের সম্বন্ধে অনেক পরামর্শ দিতে লাগিলেন, তাঁহাকে সংসারী করিবার জন্য নিজেরাও নানা প্রকারে চেষ্টাযত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছুমাত্র ফল হইল না। গদাধরের ধর্ম্ম-স্পৃহা, তন্ময়তা, সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা দিন দিন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহাকে যৌবনের প্রারম্ভেই উদাসীন সন্ন্যাসীর মত করিয়া তুলিল।

সেই সময়ে একটা ঘটনা গদাধরের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রথম সূচনা করিয়া দিয়া গেল।

কলিকাতার প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণীর গৃহে পণ্ডিত রামকুমারের অবারিতদ্বার ও যথেষ্ট প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম-সমাদর ছিল, তিনি তাঁহাদের গুরুস্থানীয় সুতরাং সেখানেও গদাধরের নাম অজ্ঞাত ছিল না। ইতিপূর্ব্বেই অনেকবার ভ্রাতৃদ্বয় সে বাড়ীতে গিয়া অনেক ক্রিয়া-কার্য্য করাইয়া আসিয়াছিলেন।

বাঙ্গালা ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবারে স্বনামধন্যা রাণী তাঁহার দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাটীতে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করিলেন। পণ্ডিত রামকুমার সেই স্থানে সর্ব্বপ্রথম দেবীর পুরোহিত নিযুক্ত হইয়া গমন করিলেন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরও সেই সময় হইতে জ্যেষ্ঠের সঙ্গে গিয়া সেই কালীবাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন।

গঙ্গাবক্ষ হইতে দক্ষিণেশ্বরের এই কালীবাড়ী এবং উদ্যানের শোভা পরম রমণীয় দেখায়। যেন কোন বাসন্তী রজনীর সোনার স্বপ্নে গড়া স্বর্গের নন্দনকানন! গঙ্গাগর্ভ হইতে প্রশস্ত সুন্দর বাঁধাঘাট উপরে উঠিয়া গিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে সুন্দর বাগান—সর্ব্বদাই ফোটা ফুলে যেন হাসির রাজ্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। সেই বাগানের পরে সারি সারি দ্বাদশটি শিব-মন্দির।

ঘাটের চাতালের সম্মুখে সুন্দর সুপ্রশস্ত বাঁধা-রাস্তা—তাহার শেষে প্রশস্ত সুন্দর তোরণ, আর সেই তোরণের পরেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। সেই প্রাঙ্গণের তিন দিকে অতিথিশালা এবং দক্ষিণের দিকে নাট-মন্দির। নাট-মন্দিরের উত্তরে কালী-মন্দির এবং সেই মন্দিরের পরে রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। তাহারও উত্তরে প্রায় প্রাঙ্গণের শেষভাগে একটি ছোট খাটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। সেই ঘরটিতেই গদাধর গিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এইত গেল ঠাকুর বাড়ীর প্রাঙ্গণের সীমানা, তারপরেই আবার পরম রমণীয় প্রকাণ্ড উদ্যান—আর সেই উদ্যানের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে মনোরম পঞ্চবটী-বন।

সেই পঞ্চবটী পরম সুন্দর, নিরালা—শান্তিপ্রদ রমণীয় স্থান। সত্য-ত্রেতার ঋষিগণের তপোবনের মত ঈশ্বরারাধনার শোক-তাপ-জ্বালা-জর্জ্জরিত সংসারের দুঃখ, কষ্ট, মোহ ভুলিবার উপযুক্ত সাধন-স্থল। সেখানে গেলে মুহূর্ত্তের মধ্যে আপনা হইতেই যেন সংসারের সকল

শোকতাপ-দুঃখ-যন্ত্রণা কোথায় পলাইয়া যায়—মন এক অপূর্ব্ব পবিত্র প্রশান্ত ভাবে বিভোর হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব যুগের রমণীয় তপোবনের মত এই শান্তিপূর্ণ কালীবাড়ীতে আসিয়া গদাধরের মন বড়ই আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি চারিদিকে যতই ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন ততই যেন সেই দক্ষিণেশ্বরের উদ্যান-বাটী সহস্র বাহু বিস্তার করিয়া চারিদিক হইতে তাঁহাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। তাঁহার আর এক মুহূর্ত্তের জন্যও সেস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা হইল না।

স্থানের মাহাত্ম্যে অনেক সময়ে বিষয়ী লোকের মনেও বৈরাগ্যের সঞ্চার হইয়া থাকে। একে তো গদাধর বাল্যাবধি শান্ত, নির্ম্মল, চিন্তাশীল, সদানন্দ, ধার্ম্মিক প্রকৃতির বালক, তাহার উপরে কলিকাতায় আগমনের পর হইতে ঠাকুরপূজা ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতে করিতে তাঁহার অন্তর সাংসারিক ভোগ-সুখের প্রতি একেবারেই অনাসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল. তাহার উপর এই শান্ত, স্নিগ্ধ, পবিত্র উপবনে মায়ের চরণতলে আসিয়া তাঁহার সমস্ত মন প্রাণ একেবারে উদাস, বিভোর, তন্ময় হইয়া গেল। হৃদয়ের স্তরে স্তরে দয়াময় ঈশ্বরের চিত্র ফুটিয়া উঠিল, তিনি সংসারের নাম পর্য্যন্ত একেবারে বিস্মৃত হইয়া সেই নির্জ্জন প্রকৃতির ক্রোড়ে আপনার প্রাণ, মন, দেহ, জীবন ঢালিয়া দিলেন।

এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে পর পণ্ডিত রামকুমারের পরিবর্ত্তে ঠাকুর গদাধরই কালীমাতার পূজক নিযুক্ত হইলেন। তখন তাঁহার প্রাণে যেন এক অপূর্ব্ব নূতন আলোক-রশ্মি ফুটিয়া উঠিল—তাঁহার জীবন-স্রোত এক নূতন পথে ধাবিত হইতে চলিল।

দিনকতক কালীমাতার পূজা করিতে করিতেই গদাধরের সম্পূর্ণ ভাবান্তর উপস্থিত হইল—তাঁহার মনের গতি বাঞ্ছিত পথে ছুটিয়া চলিল। তিনি অন্য সকল কাজকর্ম্ম ফেলিয়া দিবারাত্র অষ্টপ্রহর

মন্দির মধ্যে গিয়া একদৃষ্টে প্রতিমার পানে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে লাগিলেন।

দেহে স্পন্দন নাই—চক্ষে পলক নাই—ডাকিলে সারা নাই। বিভোর, তন্ময়, আত্মহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য অপরূপ সমাধির অবস্থা! হরি হরি! কেইবা মন্ত্র পড়িয়া পূজা করে আর কেইবা অতিথিশালা ও ঠাকুরবাড়ীর অন্য কাজকর্ম্ম দেখাশুনা করে!

গদাধরের এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া তাঁহার আত্মীয় স্বজনের মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া তাড়াতাড়ি একটি ছয় বৎসর বয়সের বালিকার সঙ্গে বিবাহ দিয়া গদাধরকে সংসারী করিবার প্রয়াস পাইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভাবান্তর

কিন্তু ভগবান যাঁহাকে লোকহিতের জন্য, জগতের দুঃখে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্য, পাপী-তাপীকে [illegible]ার করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার জন্য পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে[illegible] [illegible]তনি কি আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থে মজিয়া ক্ষুদ্র সংসার লইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারেন?

যিনি সমস্ত বিশ্বসংসারের বন্ধু—বিশ্বসংসারের দুঃখে কাতর—ধরায় দুঃখনিবারণ যাঁহার কার্য্য—এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডই যে তাঁহার সংসার, মানব, পশু, কীট, পতঙ্গ—প্রাণীমাত্রই যে তাঁহার আপনার জন, তিনি কেমন করিয়া আপনার গণ্ডীবাঁধা ক্ষুদ্র সংসারের ভিতরে আটক থাকিবেন?

সুতরাং গদাধরও তাহা পারিলেন না, বিবাহের পরেই পাগলের

মত ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে আবার ছুটিয়া দক্ষিণেশ্বরে পলাইয়া আসিলেন এবং কালীমাতার পূজা-অর্চ্চনার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন।

এবারে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অবস্থার একেবারে পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। তিনি যেন আর পূর্ব্বেকার সে গদাধর নহেন—এ যেন এক নূতন, এক অপূর্ব্ব, এক পরম পবিত্র নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিলেন।

প্রতিমার ভিতরে গদাধর মায়ের জীবন্ত—জাগ্রতরূপ দেখিলেন। যে আত্মবিস্মৃত হইয়া অহোরাত্র তন্ময়ভাবে পূজা করিয়া ভগবানকে ডাকিতে পারে, যে সংসারের সহস্র প্রলোভন ভুলিয়া কেবল মাত্র তাঁহার ভাবেই মগ্ন থাকিতে পারে, যে আপনাকে দীনের দীন—অনাথ আতুর ভাবিয়া ঐকান্তিক কায়োমনে তাঁহার দর্শন প্রার্থনা করে—দয়াময় কি তাহার মনোসাধ পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারেন? তাহা যদি হইত তবে তাঁহার "ভক্তাধীন—ভক্তবৎসল" নাম পৃথিবীতে প্রচার হইত না।

গদাধর শৈশব হইতেই তাঁহার ভাবে মগ্ন, বাল্য হইতেই তাঁহার উপর সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া—তাঁহাকেই এক মাত্র জীবন-ধন ভাবিয়া অহোরাত্র দর্শন পাইবার জন্ম ডাকিতেছিলেন, কাজেই ভক্তাধীন জগন্মাতা তেমন সন্তানকে দেখা না দিয়া থাকিতে পারিবেন কেন?

প্রহ্লাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের বলে স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া ভগবান দর্শন দিয়াছিলেন, জটীলের আকুল আহ্বানে বালক-মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া দধির ভাণ্ড দিয়া গিয়াছিলেন, আর গদাধরের মন-গলা, প্রাণ-ভোলা, আত্মহারা ডাক শুনিয়া কি তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারেন? ভক্ত যদি পুরস্কার না পায়, সাধনায় যদি সিদ্ধি না থাকে, তবে বিশ্বসংসারের মানব সে সব পথে যাইবে কেন? সুতরাং জগজ্জনীর মূর্ত্তিধারণ পূর্ব্বক প্রতিমার ভিতর হইতে গদাধরকে দর্শন দিলেন;—গদাধর সংসার

ভুলিলেন—জগৎ ভুলিলেন—মায়ের ভিতর আপনাকে মিশাইয়া জড়বৎ বসিয়া রহিলেন।

পূজা করিতে বসিয়াছেন। সে পূজার আর বিশ্রাম নাই—অন্ত নাই—পূজা করিয়াই যাইতেছেন। পূজা করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত গদাধর মায়ের পূজার ফুল আপনার মাথার উপরেই দিতেছেন।

আরতি করিতে উঠিলেন তো আরতিই করিতে লাগিলেন। বিশ্রাম নাই—শেষ নাই—অবিশ্রান্তভাবে আরতি করিয়াই যাইতে লাগিলেন। সে আরতি যে আর কখনো শেষ হইবে তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা রহিল না।

আর ধ্যান করিতে বসিলেন তো একেবারে জ্ঞানশূন্য—অচৈতন্য। দিবা নাই, রাত্রি নাই, স্থান নাই, অস্থান নাই—যেখানে ধ্যানে বসিলেন সেইখানেই একেবারে নিশ্চল প্রস্তরমূর্ত্তির মত ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিলেন—আবার যে কখনো সে ধ্যান ভাঙ্গিয়া জ্ঞান ফিরিবে সে আশা কাহারও মনে রহিল না।

সুতরাং সে অবস্থায় গদাধরের দ্বারা দেবীর পূজা-কার্য্য আর কেমন করিয়া চলিতে পারে? তিনি তো আপনার ভাবেই আপনি বিভোর হইয়া থাকেন। তখন রাণী রাসমণির জামাতা মথুর বাবু গদাধরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ মুখোপাধ্যায়কে আনাইয়া পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং গদাধরকে 'মহাপুরুষ' জ্ঞানে পরম যত্ন ও সমাদরে সেবা করিতে লাগিলেন।

তারপর হইতে গদাধর আর পূজাতেও বসিলেন না—সংসারও করিলেন না—অষ্টপ্রহর আপনার ভাবেই মগ্ন হইয়া কেবল "মা মা" করিয়া দারুণ জ্ঞানশূন্য উন্মাদের মত বেড়াইতে লাগিলেন। গদাধরের বিবাহ কেবলমাত্র নামেই হইয়া রহিল।

গদাধরের তপ নাই, জপ নাই, পূজা নাই, অর্চ্চনা নাই,

ক্রিয়া নাই, কর্ম্ম নাই—নিশিদিন কেবল আকুল ভাবে 'মা' 'মা' করিয়া ছুটিয়া বেড়ান। কখনও বা জ্ঞানশূন্য হইয়া কাঠের পুতুলের মত স্তব্ধ হইয়া থাকেন, কখনও বা বালকের মত প্রতিমার কাছে গিয়া কেবল 'মা মা' করিয়া আবদার করিয়া বেড়ান। কিন্তু একটা আশ্চর্য্য যে, বিষয়ী লোক দেখিলেই লুকায়িত হন এবং ঈশ্বরের কথা ছাড়া আর কোন কথাতেই কাণ পাতেন না।

নবম পরিচ্ছেদ

রামকৃষ্ণ

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীর কথা দেশ-বিদেশে বিখ্যাত হইয়াছিল। বিশেষ সেখানে সদাব্রত ছিল বলিয়া সর্ব্বদাই নানা দেশদেশান্তর হইতে নানা প্রকারের বিস্তর সাধুসন্ন্যাসী, জ্ঞানী, পণ্ডিত প্রভৃতি আসিয়া জুটিতেন।

তাহার উপরে গদাধরের কথা প্রচারিত হইয়া নিত্য লোক-সংখ্যা—দর্শকসংখ্যা এবং সাধু-সন্ন্যাসীর দলের যাতায়াত আরও বাড়িয়া গেল। কেহ বা তাঁহাকে দেখিয়া পরম সাধু বলিয়া উল্লেখ করিয়া গেল—কেহবা ভণ্ড বলিয়া ঘৃণায় চলিয়া গেল—কেহবা পাগল বলিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই গদাধরের ভাব পরিবর্ত্তন হইল না বরং আকুলতা এবং তন্ময়তা আরও বাড়িতেই লাগিল। সুতরাং নিত্য নিত্য নূতন নূতন সাধু-সন্ন্যাসীগণের আগমনও কমিল না।

সেই সময়ে একজন সন্ন্যাসিনী ভৈরবী আসিয়া হঠাৎ উপস্থিত হইলেন। তিনি পরম শক্তিশালিনী তপস্বিনী—পরম জ্ঞানী—সর্ব্বশাস্ত্রে

সুপণ্ডিতা। লোকে তাহাকে 'ব্রাহ্মণী' বলিয়া ডাকিত এবং সিদ্ধযোগিনী বলিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইত।

সেই ভৈরবী 'ব্রাহ্মণী' আসিয়া গদাধরের অবস্থা দেখিয়া চমকিত হইলেন। একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া চাহিয়া আনন্দাশ্রুতে ভাসিতে লাগিলেন। লোকে তাঁহার এই আশ্চর্য্য ভাব দেখিয়া অবাক হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

ব্রাহ্মণী উত্তর দিলেন—"হায়! অন্ধ মানব হাতের কাছে রত্ন পাইয়াও চিনিতে পারে না, চক্ষের সম্মুখে সুস্পষ্ট দেখিয়াও অন্ধকার ঘুচে না! ইঁহাকে সামান্য মানব ভাবিও না। জীবের দুর্গতি দর্শন করিয়া দয়াল মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া একাধারে এই ধর্ম্মবীর 'রামকৃষ্ণ' মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন!"

ব্রাহ্মণীর কথায় বহু জ্ঞানী ব্যক্তির চক্ষু খুলিল, মোহ ঘুচিল, ভ্রান্তি দূর হইল—গদাধরকে 'রামকৃষ্ণ' মূর্ত্তিতে জীবন্ত জাগ্রত দেখিয়া তাঁহার চরণে ভক্তিভরে লুটাইতে লাগিল।

ব্রাহ্মণী কিছুকাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া দিবারাত্র 'ঠাকুর-রামকৃষ্ণের' সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে চৈতন্যচরিতামৃত ও অন্যান্য বৈষ্ণব-গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। ঠাকুর সেই সকল শুনিতে শুনিতে কখনো বা আনন্দে উন্মত্ত হইয়া করতালি দিতে লাগিলেন, কখনো বা ভক্তি নীরে ভাসিতে লাগিলেন, আবার কখনো বা আকুল হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাটীতে গড়াগড়ি দিতে থাকিতেন। ঘন ঘন ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

তারপর ব্রাহ্মণী ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যে প্রণালীতে ঈশ্বরকে ডাকিলে ও ভজনা করিলে দর্শন পাওয়া যায়—শাস্ত্রের সেই সকল প্রণালী দেখাইয়া, শাস্ত্রের উপদেশ সকল দিয়া, সেইভাবে ভগবান্‌কে

ডাকিতে শিখাইয়া দিলেন। ঠাকুরও ব্রাহ্মণীকে 'গুরু' বলিয়া তাঁহার আদেশ ও উপদেশ মত ভজন-সাধন করিয়া অতি সত্বরই সেই সর্ব্বশক্তিমান দয়াল জগদীশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিলেন।

স্রোতের জল যেমন স্রোতেই মিলিয়া যায়, ঠাকুরের অন্তর্নিহিত ভক্তির প্রবাহ উথলিয়া উঠিয়া তেমনি ভক্তির-স্রোতে মিশিয়া—পূর্ণ ভক্তিময় ধর্ম্মবীর সৃষ্টি করিয়া দিয়া গেল। ঠাকুরের ঈশ্বরানুরাগ, অসামান্য ভক্তি—অনন্ত ধারায় অহোরাত্রি প্রবাহিত। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণী আনন্দে গদ গদ হইয়া উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিলেন, যে, "স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুই ধর্ম্মবীর ঠাকুর রামকৃষ্ণ রূপে জগৎ তরাইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।"

এই ঘটনার কিছুকাল পরে 'তোতাপুরী' নামক একজন সিদ্ধ মহাপুরুষ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি পশ্চিম-দেশবাসী 'পুরী' নামক সন্ন্যাসীদলের লোক বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'তোতাপুরী' বলিয়া ডাকিত।

এই মহাপুরুষ আসিয়া ঠাকুর রামকৃষ্ণকে দর্শন করিবা মাত্রই তাঁহার দুই চক্ষে দর দর ধারায় আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ভাবে উন্মত্ত হইয়া ঠাকুরকে বক্ষে আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া নাচিতে লাগিলেন এবং মুখে কহিতে লাগিলেন, "আজ আমি ধন্য হইলাম, তোমার দর্শন—তোমার সঙ্গলাভ করিলাম।"

তারপর সেই তোতাপুরী একাদিক্রমে এগারো মাস কাল দক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া ঠাকুরকে সমগ্র বেদান্ত শুনাইলেন। তোতাপুরী বিস্ময়-ভক্তি সহকারে চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন যে বেদান্ত শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া যায়। বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা জ্ঞাত হইলেন যে তাহা কেবল ভাবের ঘোর নহে, যথার্থই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সমাধি হইয়াছে অর্থাৎ ঈশ্বরে তাঁহার আত্মার মিলন হইয়া গিয়াছে।

ইহার পর হইতেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের নাম চারিদিকেই প্রচারিত হইয়া পড়িতে লাগিল। তখন আর কেহ তাঁহাকে ভণ্ড বা পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিল না। প্রত্যহ দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল, তাঁহার মুখের অমৃতের মত উপদেশ শুনিবার জন্য দলে দলে লোক আগ্রহভরে তাঁহাকে ঘিরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তখন হিন্দুধর্ম্মের কোন কোন সম্প্রদায়ের নেতাগণ পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিলেন এবং সকলেই ঠাকুরকে তাঁহাদের নিজ নিজ সভা-গৃহে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কলুটোলায় তখন 'চৈতন্য-সভা' ছিল। সেই সভার সভাপতি বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ আসিয়া একদিন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে চৈতন্য-সভায় লইয়া গেলেন। সেখানে অমনি হরিনামের রোল উঠিল—সংকীর্ত্তনের প্রবাহ ছুটিল।

সেই সংকীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের দুই চক্ষু বহিয়া দরদর ধারে প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল. তিনি কিছুক্ষণ প্রস্তর পুত্তলিকার মত স্থির ধীর স্পন্দহীন অবস্থায় রহিলেন. তারপরে তাঁহার সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল—ভাবে বিভোর তন্ময় হইয়া নাচিতে নাচিতে গিয়া স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সিংহাসনের উপর বসিয়া পড়িলেন।

সভাশুদ্ধ লোক অবাক্—চমৎকৃত! সকলেরই চক্ষে জল, মুখে হরিধ্বনি! স্বয়ং বৈষ্ণবচরণ তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া হরিধ্বনি দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "এ উন্মাদ সামান্য উন্মাদ নহে—বিশ্বপ্রেমে উন্মত্ত স্বয়ং মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব।"

সেই কথা শুনিয়া সভার অধিকাংশ লোকই ঠাকুরকে সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভাবিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন সেই চিত্র প্রকটিত

দেখিতে পাইল। অমনি সকলেই মোহিত আত্মহারা হইয়া হরিধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার চরণতলে সিংহাসনের সম্মুখে ধূলায় লুটাইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল।

শুধু যে কেবল চৈতন্য-সভায় গিয়া ঠাকুরের ঐরূপ 'দশা' অর্থাৎ ঈশ্বরের ভাবে বাহ্যজ্ঞান লোপ হইয়াছিল তাহা নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু যেমন সর্ব্বদাই নানা মহাভাবের ঘোরে দশাপ্রাপ্ত হইতেন, তাঁহারও সর্ব্বদাই সেইপ্রকার ভাবে নানারূপ 'দশা' প্রাপ্তি ঘটিতে লাগিল।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশ্বসংসার ভুলিয়া সেই সকল দশায় মগ্ন হইতে লাগিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মবীর

ঠাকুর রামকৃষ্ণ অহোরাত্রি কেবল 'মা মা' করিয়া কাঁদিতে থাকেন এবং মন্দিরে ঢুকিয়া মায়ের প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহেন, গল্প করেন, উপদেশ গ্রহণ করেন।

সজল চক্ষে জোড়হস্তে গদগদ ভাবে প্রতিমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পাগলের মত চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন, "মা আমি কেবল তোরই কথা শুনবো—শাস্ত্রও জানি না, পণ্ডিতও জানি না। তুই আমাকে বুঝিয়ে দিবি তবে বিশ্বাস করবো।"

কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন—"যিনি সেই জগৎপতি পরমেশ্বর তিনিই আমার এই স্নেহময়ী ও দয়াময়ী মা।"

এমন যে ধর্ম্মবীর ভক্তবীর, মা কি তাঁহাকে দেখা না দিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা না কহিয়া স্থির হইয়া থাকিতে পারেন? জগন্মাতা

কালী পাষাণমূর্ত্তি ফুঁড়িয়া প্রত্যক্ষ প্রকাশিত হইয়া ঠাকুরকে দর্শন দিয়া একদিন বলিয়া গেলেন—

"তুই আর আমি এক। জীবের মঙ্গলের জন্য তুই কেবল ভক্তি নিয়ে থাক্।"

সেই হইতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আবালবৃদ্ধ-বনিতা—সকলেরই প্রাণে ভক্তির উৎস বহাইতে দিবারাত্রি চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ আপনার মাতা চন্দ্রমণিকে জগজ্জননী কালী মায়ের অংশ ও রূপান্তর বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই মাতাকে কামারপুকুর হইতে আনাইয়া আপনার কাছে রাখিলেন এবং সেইরূপ ভাবিয়াই তাঁহার পূজা ও সেবা করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে বিস্তর লোক তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সকল ভক্তেরা সর্ব্বদাই ঠাকুরের কাছে আসিতে আরম্ভ করিল।

সকলেই তাঁহার ভাবাবেশ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত এবং তাঁহার শ্রীমুখের অতি সহজ সরল উপদেশ সকল শুনিয়া জ্ঞান লাভ করিয়া ধন্য হইত। তাহারা যেন নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে উজ্জ্বল আলোকে সরল, সুন্দর, সুগম পথ দেখিতে পাইত এবং সেই পথে চলিয়া শীঘ্রই সংসারের পাপ-তাপ, দুঃখ ও অশান্তি জয় করিতে শিখিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ অত্যন্ত সহজ সরল সাদাসিধা ঘরের কথায় এমন ভাবে উপদেশ দিতেন এবং উপমা দিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেন যে ক্ষুদ্র বালকটীর পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইত না।

সুতরাং কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি বৃদ্ধ কি বালক—সকলেই অত্যন্ত সহজে সে সকল হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইতে পারিত।

ব্রাহ্মধর্ম্মের অনেক উপাসক এবং ভক্ত ঠাকুর রামকৃষ্ণের কাছে আসিয়া উপদেশ লইতেন এবং ঠাকুরও বিনা ওজর আপত্তিতে তাঁহাদের সমাজে গমনাগমন করিতেন—তাহাতে তিনি বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বোধ করিতেন না। এমন কি গির্জ্জার দ্বারদেশে গিয়াও প্রভু যীশুখৃষ্টের ভজনা দেখিয়া আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন।

তিনি সকলসমক্ষে সর্ব্বদাই বলিতেন—"সকল ধর্ম্মমতই ভগবানের কাছে পৌঁছিবার ও তাঁহার দর্শন লাভ করিবার এক একটি ভিন্ন ভিন্ন পথ। সেইজন্য সকল ধর্ম্মই সত্য, কোন ধর্ম্মই মিথ্যা নহে।"

তিনি বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্মমতই সমর্থন করিতেন। ঠাকুর যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরে হিন্দুর দেবদেবীর ছবির সঙ্গে বুদ্ধ এবং যীশুখৃষ্টেরও ছবি টাঙ্গানো থাকিত। অদ্যাবধি সে সকল ছবি বিদ্যমান রহিয়াছে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ পৃথিবীর যাবতীয় স্ত্রীলোক মাত্রকেই জননী বলিয়া ভাবিতেন এবং সর্ব্বদাই সকলকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন। ভক্তদেরে কহিতেন—"জগতের স্ত্রীজাতি মাত্রকেই 'মা' বলিয়া ভাবিতে পারিলে তবে মানুষ পবিত্র হয় এবং সহজেই ভগবানের দর্শন লাভ করিতে পারে।"

এইরূপে পাপী-তাপীর উদ্ধারের উপায় করিয়া দিয়া, অন্ধ ও অজ্ঞানকে পথ দেখাইয়া দিয়া, সংসারের দুঃখ-তাপ দূর করিয়া দিয়া, সকলের জন্য সুখ-শান্তির পথ খুলিয়া দিয়া, লীলাসম্বরণ করিয়া তিনি আপনার স্বর্গরাজ্যে গমন করিয়াছেন। পাপী-তাপীকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার নিকটে লইয়া যাইবার জন্য তিনি বহু ভক্তকে সেই মহাধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এক্ষণে বারাণসী, হরিদ্বার, বৃন্দাবন, মান্দ্রাজ, উত্তরপশ্চিমাঞ্চল, যুক্তপ্রদেশ, কুমায়ূন প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা দেশে এবং ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি সুদূর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের

নানা স্থলে ছড়াইয়া পড়িয়া দুর্ব্বল মানবকে ঈশ্বরলাভের প্রশস্ত রাজপথ দেখাইয়া দিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভক্ত-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম সকলেই শুনিয়া থাকিবেন।

তবে এস ঠাকুর, আর একবার এস! তোমার সেই প্রেমোন্মাদ —ভাবোন্মাদ— বিশ্ববিমোহন-রূপে আর একবার আমাদের সম্মুখে দাঁড়াও। তোমার প্রশান্ত প্রফুল্ল মুখের মধুর হাসিতে আমাদের দুঃখের জীবনে সুখ-শান্তির জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠুক। তোমার চরণধূলি-পরশে আবার ধরণী পবিত্র হউক। তোমার চরণামৃতে আমাদের পাপ-তাপের ময়লা ধুইয়া আমরা শুভ্র পবিত্র দেব-শিশুর মত হই। আর একবার আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া হাসিমুখে তেমন করিয়া বল—

"সাধুদের পরিত্রাণ, বিনাশ-কারণে দুরাত্মার,
ধর্ম্মের রক্ষার জন্য যুগে যুগে এই অবতার।"

সম্পূর্ণ

তিন-আনা সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। মাইকেল মধুসূদন
৩। বঙ্কিমচন্দ্র
৪। রাজা রামমোহন রায়
৫। কেশবচন্দ্র
৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
৭। নেপোলিয়ন
৮। রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। রামদুলাল সরকার
১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
১১। কৃষ্ণদাস পাল
১২। হাজি মহম্মদ মহসীন
১৩। আনন্দমোহন বসু
১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন
১৫। প্যারীচরণ সরকার
১৬। লর্ড কিচ্‌নার
১৭। বিবেকানন্দ
১৮। ভূদেব
১৯। জেমসেদ্‌জী টাটা
২০। গোখ্‌লে
২১। দ্বিজেন্দ্রলাল
২২। হেমচন্দ্র
২৩। ডেভিড্‌ হেয়ার
২৪। রামতনু লাহিড়ী
২৫। লোকমান্য তিলক
২৬। স্যর গুরুদাস
২৭। শিবনাথ শাস্ত্রী
২৮। বিসমার্ক
২৯। গারফিল্ড
৩০। ম্যাটসিনি
৩১। এব্রাহাম লিঙ্কন
৩২। স্যর রাসবিহারী
৩৩। দাদাভাই নৌরজী
৩৪। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর
৩৫। কান্তকবি রজনী
৩৬। বুকার ওয়াসিংটন
৩৭। স্যার আশুতোষ
৩৮। অক্ষয় কুমার
৩৯। গ্যারিবল্ডি

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ, ৯নং পাটুয়াটুলা, ঢাকা।